আজকের কাগজ
১৪৩
২১৫
তারিখ ... 15 AUG 1991
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২
১৪

সন্ত্রাসের কারাগারে বন্দী বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গন

বিনোদ দাশগুপ্ত

আমাদের শিক্ষাঙ্গন বিশেষতঃ উচ্চতর শিক্ষায়তনগুলো থেকে শিক্ষার উপযোগী শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া বিদায় নিয়েছে অনেককাল আগে। কারো কারো মতে শিক্ষালয়ের পবিত্র পরিবেশে 'শান্তি' নামক বস্তুটি এখন এক আকাশ-কুসুম বা স্বপ্নের বস্তুতে পর্যবসিত। গোটা দেশ বহুদিন থেকে বিশেষতঃ বিগত নয় বছরের স্বৈরাচারী শাসনের আমলে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসের কবলে নিমজ্জিত হলেও শিক্ষাঙ্গনগুলোকেই এই সন্ত্রাস যেন সর্বাধিকভাবে গ্রাস করে। ব্যাপারটি শেষ পর্যন্ত এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে গোটা দেশের বিবেকই এর ব্যাপকতা ও পরিণতি নিয়ে সন্ত্রস্ত ও চিন্তিত।

দেশের চিন্তাশীল জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ, আবেগ ও হতাশা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সম্ভবতঃ যথার্থভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সে কারণেই নিশ্চয় তিনি দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রশংসনীয় একটি নয়া উদ্যোগও গ্রহণ করলেন শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার মহান লক্ষ্যে। দেশের সব বিদ্যায়তনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার

কাজেই চরিত্রগতভাবে সন্ত্রাসমাত্রই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, শিক্ষা ও দেশের অন্যান্য প্রতিটি অঙ্গনই যেহেতু রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই সন্ত্রাসও শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত সর্বত্র নানারূপে ও রং –এ ঢুকে পড়েছে।

ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১২ জুলাই সন্ধ্যায় তিনি দেশের সবক'টি রাজনীতিক দলকে এক মহাসম্মেলনে আহবান করেন। প্রায় ১০০-এর মত রাজনীতিক দলকে এতে আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে প্রকাশ, তবে সম্মেলনে নাকি ৪০টির মত রাজনীতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রধান প্রধান দলগুলোর সকলেই মোটামুটি উপস্থিত ছিলেন। এইদিক থেকেও সম্মেলনটিকে বেশ সফল এবং উৎসাহব্যঞ্জকও বলতে হবে।

তবু এখন প্রশ্ন উঠছে আহূত এই মহাসম্মেলনটি কি তার আকাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয়েছে? এ প্রশ্নের সঠিক জবাবও বোধ হয় দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এই সম্মেলন ডাকার পেছনে প্রধানমন্ত্রীর আসল উদ্দেশ্য কি ছিল সেটা বলা কঠিন। শিক্ষায়তনগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার পন্থা সম্পর্কে রাজনীতিক দলগুলোকে যে সহজে ঐকমত্যে আনা যাবে না এ সত্যটি তুলে ধরাই যদি সম্মেলনের অন্যতম এক প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে তবে সেদিক থেকে তো সম্মেলনটি বেশ সফলই হয়েছে।

অন্যদিকে সরকারের পক্ষে যেমন এই ব্যাপারে (শিক্ষাঙ্গনে শান্তি প্রতিষ্ঠা) অন্যসব দলের মনোভাব ও কৌশল জানা সম্ভব হয়েছে অন্য সব দলের পক্ষেও সরকারসহ সব দলের পারস্পরিক চিন্তাধারা বোঝার সুযোগ হয়েছে। এটাও হয়তো অংশগ্রহণকারী দলগুলোর জন্য কম পাওনা নয়।

এই সম্মেলনের মাধ্যমে কেউ অবশ্য যদি বিরাট কোন আশু সুফল লাভের আশা করে থাকেন তবে তারা যে হতাশ হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এই সম্মেলনের শুভ প্রতিক্রিয়ায় সব শিক্ষাঙ্গনে শান্তি এসে যাবে আশা করার কোন সুযোগ তখনও ছিল না এবং সহসা তা আশা করাও বাতুলতামাত্র। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই সম্মেলনে একটা ঐকমত্য অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাহ্যতঃ অন্ততঃ (তা কতখানি আন্তরিক কে জানে?) শিক্ষাঙ্গনে শান্তি সকলেই চান, আসলে এখানে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কেউ তাত্ত্বিক কিংবা নৈতিকভাবে অস্বীকার করতে পারেন না। কিন্তু সমস্যা ও মতদ্বৈধতা দেখা দেয় অশান্তি বা গোলযোগের কারণ চিহ্নিত করা এবং শান্তি রক্ষার পন্থা নিরূপণের ব্যাপারে।

স্বভাবতঃই এবারের প্রধানমন্ত্রীর আহূত মহাসম্মেলনেও শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার উপায় বা নীতিমালা সম্পর্কে সমবেত দলগুলো একমত হতে পারেননি। কিন্তু একমত হতে না পারাটা বিস্ময়কর কিছুই নয়। বরং যা ঘটেছে সেটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। কেন স্বাভাবিক? দেশের ঘটনা প্রবাহের দিকে লক্ষ্য করলেই তার সম্ভবতঃ আর কোন ব্যাখ্যা লাগে না।

বাংলাদেশের জনগণসহ পৃথিবীর বিরাট সংখ্যক মানুষ মেনে নিয়েছেন যে নিরপেক্ষ সরকারের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত এদেশে এবারের (১৯৯১) নির্বাচনটি ছিল অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত। এ সত্যটি মেনে নিয়েও কোন দলই হলফ করে বলতে পারবে না যে এই নির্বাচনের সময় সারাদেশে কোথাও সন্ত্রাস, মাস্তানী কিংবা দুর্নীতি হয়নি। রক্তারক্তি তথা খুনাখুনিও হয়েছে। অথচ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করার ব্যাপারে সব দলই ছিল ওয়াদাবদ্ধ। কেন সে ওয়াদা রক্ষা করা সম্ভব হলো না সকলের পক্ষে?

এর পেছনে রয়েছে নানা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ তথা সামগ্রিক জাতীয়-আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। কোন একক দল, গোষ্ঠী বা কতিপয় ব্যক্তিকে শুধু এজন্য দায়ী করা ঠিক হবে না। কোন সামাজিক রাজনৈতিক ব্যাধি যখন কোন দেশে বা ভূপৃষ্ঠের ব্যাপক এক এলাকা জুড়ে মহামারী আকারে দেখা দেয় দল ও ব্যক্তি নির্বিশেষে সবাই তখন কম বেশি ঐ রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। উন্নত দুনিয়ার কথা বাদ দিলেও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর রাজনীতিক-সামাজিক পরিমন্ডলে সশস্ত্র সন্ত্রাস বহুকাল যাবত প্রায় এক স্থায়ী রূপ নিয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সবক'টিতে রোগটি খুব এক বিপজ্জনক পর্যায়ে না পৌঁছলেও স্বৈরশাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট কিছু দেশে তা অনেকটা আশঙ্কাজনক রূপ নিয়েছে।

এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভবও হয়তো অবধারিত। কারণ সাধারণ নিয়মে নিশ্চয় বলা যায় যে, দেশীয়ভাবে স্বৈরাচার এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদের ছত্রচ্ছায়ায় সন্ত্রাসের জন্ম। কাজেই চরিত্রগতভাবে সন্ত্রাস মাত্রই রাজনৈতিক সন্ত্রাস, শিক্ষা ও দেশের অন্যান্য প্রতিটি অঙ্গনই যেহেতু রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাই সন্ত্রাসও শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে খেলার মাঠ পর্যন্ত সর্বত্র নানারূপে ও রং-এ ঢুকে পড়েছে। দৃশ্যতঃ কোথাও কোথাও এসব সন্ত্রাসকে রাজনীতিক সম্পর্ক বর্জিত মনে হলেও গভীর অনুধাবনের মাধ্যমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর রাজনৈতিক চরিত্র ধরা পড়তে বাধ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দেশীয় স্বৈরতন্ত্র কিংবা আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীসমূহের প্রধান স্তম্ভ সাম্রাজ্যবাদের উদ্যোগে ও উৎসাহে মূলতঃ সন্ত্রাসের জন্ম। বিশেষতঃ সাম্রাজ্যবাদীরা এযুগের সন্ত্রাসকে আর কেবল কোন এক বিশেষ দলের প্রক্রিয়াভুক্ত বা একক সম্পত্তি হিসেবে রাখতে নারাজ। অনুন্নত দেশগুলোর রাজনীতি তথা সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ নানা কায়দায় নিজেদের হাতের মুঠিতে রাখার জন্য এই সন্ত্রাসকে জনগণের বিভিন্ন স্তরে তারা অতি সূক্ষ্মভাবে জড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাছাড়া দেশীয় প্রতিক্রিয়া ও নিজেদের স্বার্থে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন দিকে বিভিন্নভাবে এই বীজ বুনে বেড়ায়। এই সব প্রক্রিয়া কিছুদিন চলার পর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বিভিন্ন মহলে অতিসহজ ও নিত্যব্যবহার্য এক হাতিয়ারে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তা-ই হয়েছে। এদেশে স্বৈরশাসনের সূত্রপাত বহুকাল আগে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানী আমলের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই আমরা স্বৈরতন্ত্রের কবলে পতিত। সশস্ত্র পথে স্বাধীনতা অর্জন করেও বেশিদিন কিন্তু এদেশে স্বৈরতন্ত্রের কবলমুক্ত থাকতে পারেনি। এটাও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কাজেই স্বৈরতন্ত্রের জন্মের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের নানা ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক চক্রান্তও ব্যাপকাকারে শুরু হয়ে যায়।

নয়াসাম্রাজ্যবাদী ও উন্নত ধনবাদী দেশগুলোর দান ও ঋণনির্ভর দরিদ্র দেশগুলোতে সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় প্রতিক্রিয়ার উদ্যোগে জনগণের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সন্ত্রাস প্রায় অহরহ যেভাবে লাগিয়ে রাখা হয়েছে তার মূল লক্ষ্য হলো জনগণকে বিশেষতঃ তরুণ সমাজকে রাজনীতি বিমুখী করে হাইজ্যাকিং, মাস্তানী ও অন্যান্য সামাজিক অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়া। শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করে দিয়ে জাতির উন্নয়ন সম্ভাবনা স্তব্ধ করে দেয়াও সন্ত্রাসের আর একটি প্রধান লক্ষ্য। এ জন্যই আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসের ভয়াবহ উৎপাত আজ সর্বাপেক্ষা বেশি। এর আরও একটি কারণ আছে।

দেশী-বিদেশী সব প্রতিক্রিয়াই এদেশের দীর্ঘ অতীত রাজনীতিক ইতিহাসের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছে, প্রধানতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষালয়ের ছাত্রসমাজের গৌরবময় নেতৃত্বেই শুধু যে মহান আন্দোলনগুলো হয়েছে তা নয় স্বাধীনতা অর্জনসহ জনগণের সব স্মরণীয় অভূতপূর্ব বিজয়গুলোও অর্জিত হয়েছে উচ্চতর বিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে। এই স্বাধীন দেশে প্রতিক্রিয়াশীলরাই আবার সর্বক্ষেত্রে জেঁকে বসেছে। এরা নিজেদের নিষ্ঠুর শোষণ-শাসন নিশ্চিত, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন করার পথে এই ছাত্রসমাজ আবার ভবিষ্যতে প্রধান বিপদ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে। কারণ এই সেদিনও তারা দেখলো যে প্রায় দশ বছরের প্রবল প্রতাপশালী স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটবার ব্যাপারে এই ছাত্রসমাজই পালন করেছে এক মুখ্য ভূমিকা। স্বভাবতই এই ছাত্রসমাজ প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে বাঘের চেয়েও বেশি ভীতিপ্রদ। কাজেই ছাত্রসমাজকে বীভৎস সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দিয়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলুষিত করতে না পারলে যাবতীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে ধ্বংসাভিযান আবারও শুরু হবে ছাত্রদের নেতৃত্বে।

একজন স্বৈরাচারী শাসকের পতন হলেও স্বৈরতন্ত্রের খুঁটিগুলো সর্বত্র স্ব স্ব অবস্থানে সুদৃঢ়ভাবে বসে আছে। সামান্য কয়েকদিন সন্ত্রস্ত ও সংযত থাকলেও আবার স্বমূর্তিতে তারা আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কাজও শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মাত্রাও তাই দিন দিন বেড়ে চলেছে। এখন গোটা দেশে প্রায় ১০০ এর মত শিক্ষায়তন সম্পূর্ণ বন্ধ। কোন কোন রাজনৈতিক ও অন্যান্য মহল সাংগঠনিকভাবেও হয়তো প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। তবে বেশির ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় অনুপ্রবেশকারী প্রতিক্রিয়ার অনুচরের মাধ্যমেই হয়তো শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস এক অপ্রতিরোধ্য পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রাজনীতিকভাবেই

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে হয়তো সে দৃষ্টিতেই দেখা সমীচীন। কারণ সেখানে একটি গোষ্ঠী সাধারণ সন্ত্রাসের আওতা ছাড়িয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে বসে আছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার বা অসহায়।

এর মোকাবিলা করতে হবে বটে। তবে সহজে যে সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে না সে কঠোর সত্যটিও নিশ্চয় মেনে নিতে হবে।

সর্বোপরি তৃতীয় দুনিয়ায় এখন বাংলাদেশের মত দরিদ্র ও শিক্ষা-নির্ভর (ঋণ সাহায্য ইত্যাদি) বেশিরভাগ দেশের সরকারের পক্ষে বিভিন্ন বিদেশী শক্তির (এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজনীতিক শক্তিগুলোর) প্রচন্ড চাপ উপেক্ষা করার মত শক্তি সাহস বা ইচ্ছা (শ্রেণী স্বার্থের কারণে) কোনটাই প্রায় না থাকার ফলে ব্যাপারটি হয়ে উঠছে আরও জটিলতর। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতিকে হয়তো সে দৃষ্টিতেই দেখা সমীচিন। কারণ সেখানে একটি গোষ্ঠী সাধারণ সন্ত্রাসের আওতা ছাড়িয়ে কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে সরাসরি অস্বীকার করে বসে আছে। অথচ কর্তৃপক্ষ নির্বিকার বা অসহায়।

বিনোদ দাশগুপ্তঃ কলাম লেখক ও সাংবাদিক। একটি ইংরেজী জাতীয় দৈনিকে কর্মরত।